3.9. অক্সিজেনের অভাব বা হাইপক্সিয়া (Hypoxia)

সংজ্ঞা (Definition) ঃ কলাকোশে অক্সিজেনের ব্যবহার হ্রাস পেলে তাকে **হাইপক্সিয়া** বলে।

বিভিন্ন অবস্থায় কোশে অক্সিজেনের ব্যবহার হ্রাস পেতে পারে। রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়াকে **হাইপক্সেমিয়া (hypoxemia)** বলে। হাইপক্সিয়ার ফলে দেহে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রকারভেদ (Types) ঃ বিভিন্ন কারণে হাইপক্সিয়া হয়ে থাকে। এই কারণগুলির উপর নির্ভর করে হাইপক্সিয়াকে **চারভাগে** ভাগ করা হয়ে থাকে। এগুলি হল—

1. হাইপক্সিক হাইপক্সিয়া (Hypoxic hypoxia) ঃ পরিবেশের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ স্বাভাবিকের তুলনায় কম হলে কলাকোশে অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যাকে **হাইপক্সিক হাইপক্সিয়া** বলে। সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ট থেকে 10,000 ফুট উচ্চতায় বা তার অধিক উচ্চতায় অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ কম হওয়ার ফলে অক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপাদন স্বাভাবিকের তুলনায় কম হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

2. অ্যানিমিক হাইপক্সিয়া (Anaemic hypoxia) ঃ রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় হ্রাস পেলে কলাকোশে অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যাকে **অ্যানিমিক হাইপক্সিয়া** বলে। এক্ষেত্রে পরিবেশের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ স্বাভাবিক থাকলেও রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের (14–15 g/dl) তুলনায় কম থাকার জন্য অক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপাদন হ্রাস পায়। সাধারণত অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা রোগে, বিভিন্ন রক্তক্ষরণ জনিত রোগে এই প্রকার হাইপক্সিয়া ঘটে থাকে।

3. হাইপোডায়নামিক বা স্ট্যাগনেন্ট হাইপক্সিয়া (Hypodynamic or Stagnant hypoxia) ঃ রক্তবাহের মাধ্যমে রক্তের গতিপ্রবাহ স্বাভাবিকের তুলনায় হ্রাস পেলে কলাকোশে অক্সিজেনের সরবরাহ জনিত ত্রুটির ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে **হাইপোডায়নামিক বা স্ট্যাগনেন্ট হাইপক্সিয়া** বলে। এক্ষেত্রে পরিবেশের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ ও রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকলেও রক্ত প্রবাহের ত্রুটিজনিত সমস্যার ফলে একক সময়ে কলাকোশে অক্সিজেনের সরবরাহ কম হওয়ার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়।

4. হিস্টোটক্সিক হাইপক্সিয়া (Histotoxic hypoxia) ঃ কলাকোশে বিভিন্ন টক্সিক বা বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সঠিক ব্যবহার বিঘ্নিত হলে যে হাইপক্সিয়ার সৃষ্টি করে তাকে **হিস্টোটক্সিক হাইপক্সিয়া** বলে। এই প্রকার হাইপক্সিয়ায় কোশে উপস্থিত বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থের যেমন সায়ানাইড, উপস্থিতির ফলে মাইটোকনড্রিয়ার বিভিন্ন উৎসেচকগুলির ক্রিয়াশীলতা হ্রাস পায় এবং কলাকোশে অক্সিজেনের প্রকৃত ব্যবহার বিপর্যস্ত হয়। এই প্রকার হাইপক্সিয়ায় পরিবেশের অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ, রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ এবং রক্তবাহের মাধ্যমে রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক থাকলেও কলাকোশে টক্সিক এবং বিষাক্ত পদার্থের উপস্থিতির ফলে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন যে ভূমিকা অবলম্বন করে সেটি অর্থাৎ প্রান্তীয় শ্বসন বিঘ্নিত হয়।

লক্ষণ (Symptoms) ঃ হাইপক্সিয়ার বিভিন্ন লক্ষণগুলি হল—

- মাথাধরা, মাথা যন্ত্রণা, বমি ভাব, অস্থিরতা।
- অনিদ্রা, মানসিক অবসাদ।
- শ্বাসকার্য ও হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বৃদ্ধি।
- ক্ষুদামান্দ, কঠিন খাদ্যবস্তু গ্রহণে অনীহা।
- শ্রমে অনীহা, কান্তি, অবসাদ ইত্যাদি।

প্রভাব (Effect) ঃ মানবদেহে হাইপক্সিয়ার প্রভাব সবচেয়ে বেশি হাইপক্সিক হাইপক্সিয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। সাধারণত ভূ-পৃষ্ট থেকে 10,000 ফুট (3000 মিটার) বা তার অধিক উচ্চতায় এই প্রভাবগুলি প্রকট হয়। এগুলিকে একত্রে **পর্বতপীড়া** বা **মঙ্গীস্ ডিসিজ** (Mountain sickness or Monge's disease) বলে। এগুলি হল—

- অক্সিজেনের কম পার্শ্বচাপ জনিত কারণে ব্যক্তির দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে রক্তে CO_2-এর পরিমাণ হ্রাস পেয়ে রেস্পিরেটরি অ্যালকালোসিস (Respiratory alkalosis) হয়।

- তাৎক্ষণিক প্রভাব হিসাবে ব্যক্তির মাথাযন্ত্রণা, খিটমিটে মেজাজ, শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সমস্যা, অনিদ্রা, বমিভাব ইত্যাদি যেসব উপসর্গগুলি ওই পরিবেশে উপস্থিত হওয়ার 8–24 ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ করা যায় সেগুলি প্রধানত মস্তিষ্কের কলাকোশে শোথের বা ইডেমার ফলে ঘটে থাকে। একে **সেরিব্রাল ইডেমা** (Cerebral aedema) বলে। ধমনি রক্তে O_2-এর পার্শ্বচাপ কম হওয়ার ফলে ধমনি ও উপধমনিগুলির প্রসারণ ঘটে এবং সেরিব্রাল সংবহন বিপর্যস্ত হলে জালিকাগুলির চাপ বৃদ্ধি পেয়ে মস্তিষ্ক কলাকোশবর্তী অঞ্চলে তরলপদার্থ জমা হয়ে সেরিব্রাল ইডেমা ঘটে। একে **হাই অল্টিচুড সেরিব্রাল ইডেমা** বা **উচ্চতা জনিত মস্তিষ্কের শোথ** বলে।

- ফুসফুসের কলাকোশ মধ্যবর্তী অঞ্চলে রক্তের তরল অংশ জমা হয়ে পালমোনারী **ইডেমা** (Pulmonary Oedema) হয়। পালামোনারী ইডেমার ফলে ফুসফুসীয় রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় এবং বহুদিন এই অবস্থা চলতে থাকলে ডান নিলয়ের স্ফীতি বা রাইট ভেন্ট্রিকিউলার হাইপারট্রফি হয়। একে **হাই অল্টিচুড পালমোনারী ইডেমা বা উচ্চতা জনিত ফুসফুসীয় শোথ বলে।**

প্রতিকার (Prevention) ঃ নিম্নলিখিত প্রতিকার ব্যবস্থা হাইপক্সিয়ার প্রভাবকে প্রতিহত করতে সাহায্য করে—

- সমুদ্রপৃষ্ট থেকে হঠাৎ 10,000 বা তার অধিক উচ্চতা সম্পন্ন অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে কায়িকশ্রম করা উচিত নয়।

- হাল্কা ধরনের কাজে ব্যক্তিকে নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন।

- পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে একটি উচ্চতায় বেশ কিছুদিন থেকে পরবর্তী উচ্চতায় আরোহণ করলে দেহে আবহসহিষ্ণুতার ফলে হাইপক্সিয়ার প্রভাবকে প্রতিহত করা সম্ভব হয়।

- হাইপক্সিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে অক্সিজেন থেরাপী দেওয়া প্রয়োজন।

- হাইপক্সিয়ার প্রভাব দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে সমতলে বা কম উচ্চতা জনিত অঞ্চলে নামিয়ে এনে হাইপক্সিয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা করা সম্ভব।।

- মূত্রের পরিমাণ কম হলে কার্বনিক অ্যানাহাইড্রেজ প্রতিরোধক ব্যবহার করে অ্যালকালোসিস প্রতিরোধ করা যায়।

- গ্লুকোকর্টিকয়েড জাতীয় ড্রাগ সেরিব্রাল ইডেমাকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

19. কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বলতে কী বোঝো? কখন এই রকম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন হয়? কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করো।

Ans. ■ **সংজ্ঞা (Definition) :** *কোনো ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড সচল থাকা সত্ত্বেও শ্বাসক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে বা শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে শ্বাসক্রিয়াকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাকে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বলে।*

■ **কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা :** জলে ডোবা, কার্বন মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, ইলেকট্রিক শক খাওয়া, হৃদ্‌রোগ ইত্যাদি সংকটময় কারণে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

■ **কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার পদ্ধতি (Method of Artifical Respiration) :** কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দু-ভাগে বিভক্ত, যথা—**হস্তকৃত পদ্ধতি** এবং **যান্ত্রিক পদ্ধতি**।

A. হস্তকৃত পদ্ধতি ঃ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া যেসব কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দেওয়া হয়। যেমন—

1. ইভের দোলন পদ্ধতি (Rocking Method of Eve) ঃ এই পদ্ধতিতে রোগীকে কোনো একটি স্ট্রেচারে উপুড় করে শোয়ানো হয়। স্ট্রেচারটিতে উপর-নীচে ওঠা-নামার ব্যবস্থা আছে। রোগীকে স্ট্রেচারের ওপর উপুড় করে শুইয়ে কোমরে এবং পায়ে ফিতে দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়।

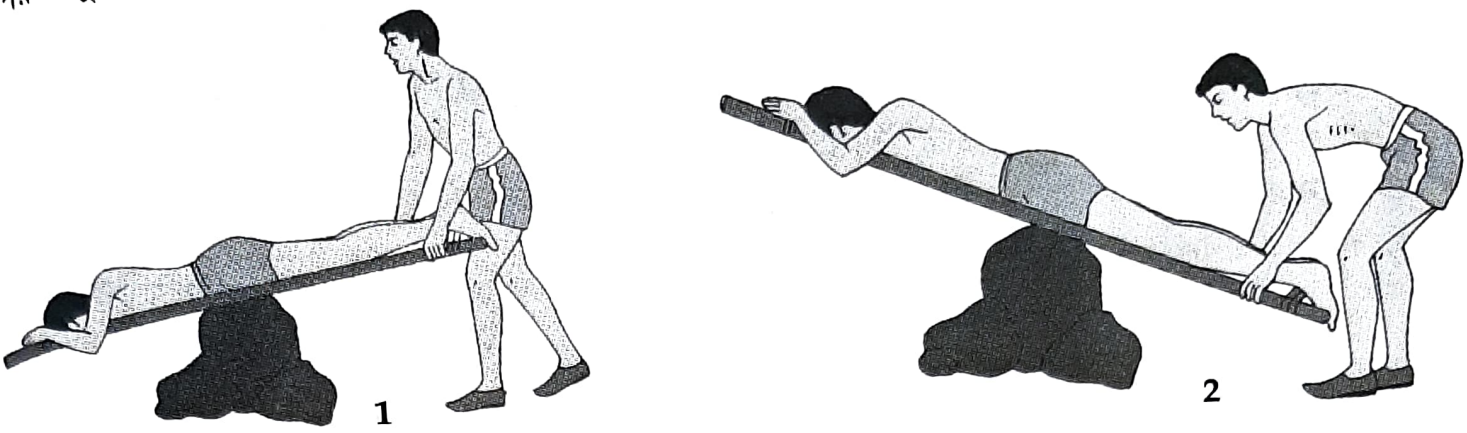

ইভের দোলন পদ্ধতি

এখন স্ট্রেচারটিকে ওপর-নীচে দোলানো হয়, ফলে যখন মাথা ওপরের দিকে ওঠে তখন পা নীচের দিকে থাকে। আবার যখন পায়ের দিক ওপরে ওঠানো হয় তখন মাথার দিক নীচে নেমে আসে। এইভাবে 45° কোণে পর্যায়ক্রমে উপর-নীচে দোলানো হয়। প্রতি মিনিটে 8-9টি দোলন দেওয়া হয়। 7 সেকেন্ড স্থায়িত্বসম্পন্ন দোলনের সময় মাথাকে 3 সেকেন্ড এবং পা-কে 4 সেকেন্ড নীচের দিকে রাখতে হয়। যখন মাথা নীচের দিকে থাকে তখন উদরের অঙ্গাগুলি মধ্যচ্ছদাকে ওপরের দিকে ঠেলে দেয়। ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু বেরিয়ে যায়। অর্থাৎ নিশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। যখন পা দুটিকে নীচে নামানো হয় তখন মধ্যচ্ছদা নীচের দিকে নেমে আসে ফলে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে। অর্থাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

2. মুখ থেকে মুখ পদ্ধতি (Mouth to Mouth method) ঃ এই পদ্ধতিতে রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে ঘাড়টিকে হেলিয়ে দিয়ে এক হাত দিয়ে রোগীর নাক চেপে ধরতে হয় এবং অপর হাত দিয়ে থুতনিকে নীচের দিকে নামিয়ে রোগীর মুখে মুখ দিয়ে জোরে বায়ুকে ফুসফুসের মধ্যে ঢোকানো হয় (স্বাভাবিক প্রবাহী বায়ুর পরিমাণের দ্বিগুণ পরিমাণ বায়ুকে জোরপূর্বক রোগীর ফুসফুসে ঢোকানো হয়)। ফলে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং বক্ষ গহ্বর প্রসারিত হয়। এইভাবে মিনিটে 14-28 বার (গড়ে 18 বার) ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করাতে হয়। কিছুক্ষণ পরেই রোগীর স্বাভাবিক শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়।

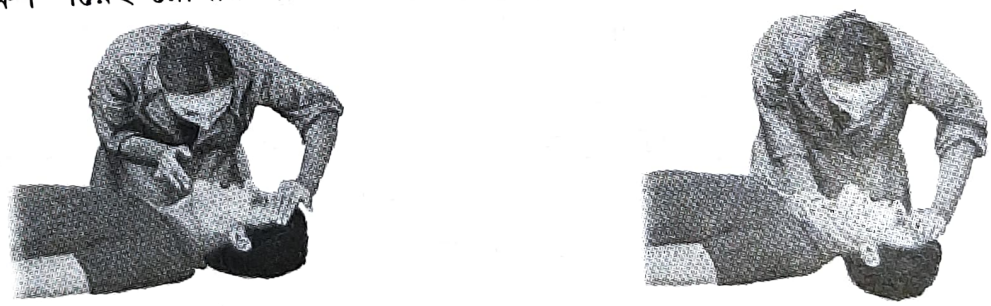

1. মুক্ত শ্বাসপথ ও চিবুক খোলা

2. চিবুক তুলে মাথা পিছনে হেলিয়ে রাখা

3. শ্বাস পরীক্ষা

4. সঞ্জীবন ফুৎকার

মুখ থেকে মুখ পদ্ধতি

3. হোলজার নেইলসেন পদ্ধতি (Holger Nielsen Method) ঃ এই পদ্ধতিতে রোগীর হাতের কনুই ভাঁজ করে বাহুদুটিকে ঘাড়ের সঙ্গে জোর করে চেপে ধরে রোগীকে উপুড় করে শুইয়ে দেওয়া হয়। মুখ গহ্বরে শ্লেষ্মা, জল ইত্যাদি থাকলে তা পরিষ্কার করে নিতে হয়। পরিচালক রোগীর মাথার দিকে হাঁটু গেড়ে বসে তার হাত দুটি রোগীর পিঠের দু-পাশে রেখে ধীরে ধীরে চাপ দিতে দিতে সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের দেহের ওজন রোগীর ওপর স্থাপন করে। এই চাপে বক্ষগহ্বর সংকুচিত হবে এবং মধ্যচ্ছদা ওপরের দিকে উঠে যাবে, ফলে ফুসফুস থেকে বায়ু দেহের বাইরে নির্গত হয়ে যাবে। অর্থাৎ নিশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

পরিচালক এখন সোজা হয়ে উঠে রোগীর হাত দুটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসবে তাহলে মধ্যচ্ছদা পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে, বক্ষগহ্বরে শূন্যস্থান সৃষ্টি হবে তখন বাইরের বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ প্রশ্বাস ক্রিয়া ঘটবে।

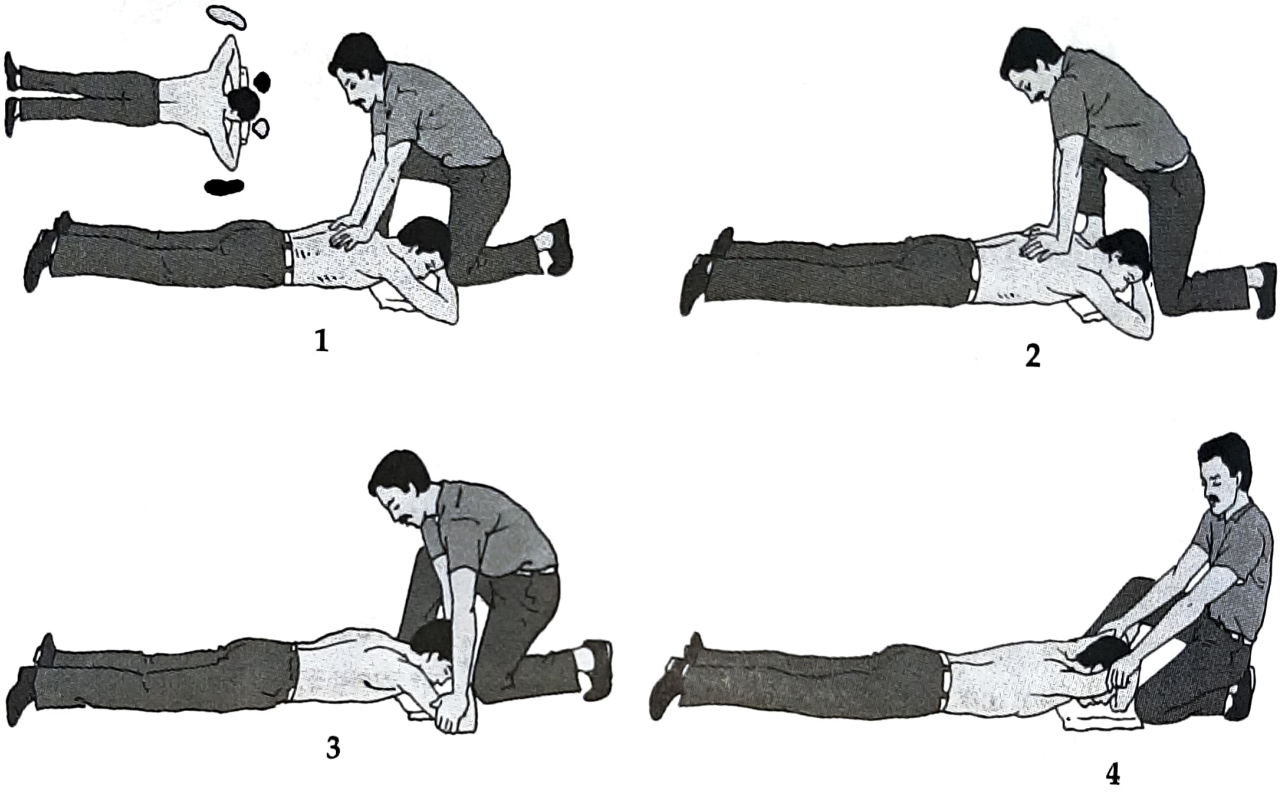

হোলজার নেইলসেন পদ্ধতি

B. যান্ত্রিক পদ্ধতি (Instrumental Method) ঃ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বহুক্ষণ ধরে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দেওয়া সম্ভব হয় এবং অক্সিজেনকে সরাসরি কলাকোশে প্রবেশ করানো সম্ভব হয়।

(a) ড্রিংকারের পদ্ধতি (Drinker's Method) ঃ এই পদ্ধতিতে রোগীর দেহটি একটি বায়ু নিরোধক কক্ষে রাখা হয় এবং কেবল মস্তকটিকে এই কক্ষের বাইরে রাখা হয়। কক্ষের সঙ্গে যুক্ত একটি যান্ত্রিক পাম্পের সাহায্যে কক্ষের বায়ুচাপকে ক্রমান্বয়ে বাড়ানো ও কমানো হয়। বায়ুচাপ কম হলে রোগীর দেহে বায়ু প্রবেশ করে এবং বায়ুর চাপ বেশি হলে রোগীর ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যায়। এইভাবে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া যতক্ষণ খুশি চালানো যায়।

(b) সবিরাম বায়ুস্ফীতি পদ্ধতি (Intermittent inflation method) ঃ এই পদ্ধতি মনুষ্যেতর কোনো প্রাণীর কৃত্রিম শ্বাসকার্য দেওয়া হয়। প্রাণীটির ট্রাকিয়াতে সরাসরি পাম্পের নল প্রবেশ করিয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুকে পাম্প করে ফুসফুসে ঢোকানো হয়। যান্ত্রিক পাম্পের নলের সঙ্গে একটি পার্শ্বনালি দিয়ে নিশ্বাস বায়ু স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসে।

❖ **নবজাতকের কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া ঃ** শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আওয়াজ করে কেঁদে ওঠে। ফলে তার শ্বাসক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু যেসব শিশুর স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া শুরু হয় না তার কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

নবজাতকের কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া নিম্নরূপ—

1. জন্মের পর শিশুর পা দুটি বাম হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হয় এবং পিঠে দ্রুত চাপড় মারতে হয়। ফলে শিশু কিছুক্ষণের মধ্যে কেঁদে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চালু হয়।

2. শিশুর মুখের ভিতরকার লালা পরিষ্কার করে মুখের ওপর একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুখে চাপা দিয়ে শুশ্রূষাকারী তার মুখ শিশুর মুখে দিয়ে জোরে শ্বাসত্যাগ করতে হয়। ফলে শিশুর ফুসফুসে বায়ু ঢোকে এবং তৎক্ষণাৎ বায়ু বেরিয়ে যায়। মিনিটে 14-20 বার এরকমভাবে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া দেওয়া হলে তার স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়া চলতে থাকে।

3. দুটি গামলার একটিতে উষ্ণ জল এবং অপরটিতে শীতল জল নিয়ে শিশুর সারাদেহ কয়েক সেকেন্ড করে পর্যায়ক্রমিকভাবে ডোবালে শিশুর শ্বাসক্রিয়া চালু হয়ে যায়।